জন্মসার্ধশতবর্ষে গগনেন্দ্রনাথ

জন্মসার্ধশতবর্ষের প্রাকলগ্নে পড়ে শেষ করলেন গগনেন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা বাংলার প্রথম বই। তারপর সন্ধিনী রায়চৌধুরী-র কলমে উঠে এলেন অন্য এক গগনেন্দ্রনাথ।

ভারতীয় শিল্পজগতে নতুন পথের পথিক গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি ছিলেন দ্বারকানাথের প্রপৌত্র। দ্বারকানাথ ঠাকুরের শিল্পপ্রীতির কথা সর্বজনবিদিত। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তিনি ইউরোপীয় শিল্পকলার বহু মনোজ্ঞ নিদর্শন সংগ্রহ করেন। দ্বারকানাথের এই শিল্পপ্রীতির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তাঁর পুত্রেরাও। পরম্পরার অধিকারে অর্জিত শিল্প-প্রবণতার সেই ঐতিহ্যকে নিজের মনন আর মণীষার মাধুর্যে মণ্ডিত করেন গগনেন্দ্রনাথ। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর (৩রা আশ্বিন ১২৭৪) জোড়াসাঁকোয় গুণেন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান গগনেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। মা সৌদামিনী দেবী। আর পাঁচটা বালকের মতো গগনেন্দ্রনাথের ছবি আঁকার হাতেখড়ি হয় সেন্টজেভিয়ার্স স্কুলে। সেখানে পাঠক্রমের অন্যান্য বিষয়ের অনুশীলনের সঙ্গে তাঁকে ছবিও আঁকতে হতো। পারিবারিক শিল্পচর্চার পরিমণ্ডলের প্রভাবে ছেলেবেলা থেকেই তিনি শিল্পানুশীলনে সাফল্যের পরিচয় দিয়ে পুরস্কৃত হন। কিন্তু স্কুলজীবনের পরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেই চারুকলাচর্চা স্থগিত থাকে। সেইসময় গগনেন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ অথবা সমবয়সী কিম্বা কণিষ্ঠদের অনেকেরই শিল্পচর্চায় আকর্ষণ ছিল তবু তাঁকে ঠাকুরবাড়ির শিল্পাঙ্গণে আর দেখা যায় না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিল্পানুশীলনের চেয়ে সভা-সমিতির কাজই তাঁকে আকর্ষণ করতো বেশি, যদিও জোড়াসাঁকোর বাড়ির পরিবেশ তখনও শিল্পকলাচর্চার অনুকূলই ছিল। অতঃপর গগনেন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের বাস্তব সূচনা হয় অচিন্ত্যনীয় এক পরিবেশে। নিজের পুত্রের মৃত্যুর পটভূমিকায় সন্তানশোক ভুলতে আবার তিনি চারুকলাচর্চার উপকরণ হাতে তুলে নেন।

গগনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র গেহেন্দ্রনাথের বয়স যখন ষোলো তখন ১৯০৪ সালে খুব ধুমধাম করে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই টাইফয়েডে গেহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। পুত্রের এই আকস্মিক মৃত্যুতে গগনেন্দ্রনাথ ভেঙে পড়েন দুঃসহ শোকে। সমব্যাথী সুহৃদ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন গগনেন্দ্রনাথের মনঃকষ্ট উপলব্ধি করে শোক উপশমের জন্য কথকতা শোনার পরামর্শ দেন এবং কথক ক্ষেত্র ঠাকুরকে নিয়ে আসেন

জোড়াসাঁকোতে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় গগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে বসতো কথকতার আসর। তন্ময় হয়ে কথকের উপাখ্যান শুনতে শুনতে গগনেন্দ্রনাথের মনে কথক ক্ষেত্র-চূড়ামণির ছবি আঁকার ইচ্ছা জাগে। তিনি কাগজ পেনসিল নিয়েই আসরে বসতেন এবং এইভাবে শোক উপশমের উদ্দেশ্যে আয়োজিত কথকতার আসরে বসেই গগনেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষভাবে ছবি আঁকার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে ছবি আঁকার এই প্রেরণা নিয়ে তিনি তাঁর সান্নিধ্যে আসা বহু মানুষের প্রতিকৃতি এঁকেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন : 'গগনবাবুদের বাড়ীতেই ভারতীয় শিল্পকলার নবজন্ম – এ ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের নাম সমস্ত জগতে প্রচারিত – কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের দানও অল্প নহে। গগনবাবু যশঃলিপ্সু ছিলেন না। তিনি না আঁকিয়া থাকিতে পারিতেন না বলিয়া আঁকিতেন – প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। আমি কখনই তাঁহাকে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখি নাই।'

স্বদেশী যুগের আগের ঘটনা। জাপানি শিল্পী ওকাকুরা – সঙ্গে আরো তিনশিল্পী টাইকান, কাৎসুতা ও হিসিদা জোড়াসাঁকোয় গগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তখনই জাপানি শিল্পীদের ছবি আঁকার কায়দা-কৌশল চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পান গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ। তাঁদের চিত্রাঙ্কনের রীতিনীতিতে উভয়েই আকৃষ্ট হন। অনুমান করা হয় এই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের চিত্রচর্চার প্রকৃত অনুশীলন। নিজেদের বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথের পাশেই ছিল তাঁর বসবার জায়গা। দুই ভাই দু-তিন হাতের ব্যবধানে পাশাপাশি বসে ছবি আঁকতেন কিন্তু ছবি আঁকার রীতিনীতি দুজনের ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নিবিড় অনুশীলন ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে গগনেন্দ্রনাথ খুঁজে পান তাঁর নিজস্ব মনোজগত যা রূপ রস আর মননের এক অনাস্বাদিত স্বাদে ভরপুর। মনে রাখতে হবে, কোনো আর্ট স্কুলে চারুকলাচর্চার সুযোগ তাঁর হয়নি। নিজের নিপুণ নিষ্ঠার যে প্রকরণগত কলাকৌশল তিনি আয়ত্ত্ব করেন তা অভিনব এবং অদৃষ্টপূর্ব। তাঁর কোনো গুরু নেই, – নেই কোনো উত্তরসাধকও। নিজেই নিজের অন্তর্মাধুর্যের উন্মোচন করে তিনি যেন স্বয়ম্ভু। স্বয়ংপ্রভ গগনেন্দ্রনাথের উত্তরণের সে ইতিহাস বিশেষভাবে স্মরণীয়।

অতঃপর গগনেন্দ্রনাথের গ্রন্থ চিত্রাঙ্কণে মনোনিবেশ এবং শুরু হয় চিত্রাঙ্কণের আর এক পর্ব। শিল্পী হিসাবে খ্যাতির সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সেই সময় স্বল্পখ্যাত গগনেন্দ্রনাথকেই তাঁর *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে অলংকরণের দায়িত্ব দেন রবীন্দ্রনাথ। *জীবনস্মৃতি*-র ছবিগুলির মাধ্যমে জোড়াসাঁকোর বাড়ির অধিবাসী আর অন্দরমহলের যথাযথ রূপটি ধরে রেখেছেন তিনি। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' থেকে শুরু করে চাঁদের আলোয় মহর্ষির সান্নিধ্যে

উপবিষ্ট বালক রবীন্দ্রনাথ অথবা বাড়ীর পরিচারকের সলতে পাকানোর দৃশ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে অতীতের জোড়াসাঁকোর পরিবেশটি। জীবনস্মৃতিতে দু-তিনটি প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের তিনটি মুখচ্ছবির সঙ্গে শ্রীকণ্ঠবাবুর গোলগাল প্রতিকৃতিও এঁকেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। বস্তুতঃ *জীবনস্মৃতি*-তে লেখনীর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে চিত্রাঙ্কনের অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। *জীবনস্মৃতি*র ছবিগুলির রচনাকাল ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ এবং চিত্রে জাপানি কলাকৌশলের প্রয়োগ লক্ষণীয়। *জীবনস্মৃতি*র চিত্রাঙ্কণে গগনেন্দ্রনাথ যে জাপানি চিত্রকলার রীতিনীতি এবং আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পরবর্তী চিত্রাঙ্কণ পর্বেও তিনি জাপানি শিল্পীদের কালিতুলির ড্রইং-এর অনুসারী এবং এই ধারায় চাইনিজ কালির সাহায্যে কতকগুলি অসামান্য কাকের ছবি এঁকেছেন। চালাক চতুর কাকের ভীতি-বিহ্বল চাউনি কিংবা গ্রীবাভঙ্গি বা ওদের দলবেঁধে ঝগড়ার দৃশ্য শিল্পীর তুলির বলিষ্ঠ টানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কাকের এই ছবিগুলির কয়েকটি *Ten Indian Studies* নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছিল। গগনেন্দ্রনাথের প্রথম চিত্রসংকলনটির প্রকাশকাল ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ।

চিত্রে শিল্পীর নিজের প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার জাপানের দীর্ঘদিনের প্রথা। গগনেন্দ্রনাথও জাপানি শিল্পীদের অনুকরণে নিজের আঁকা ছবিতে নামের আদ্যাক্ষর জি টি -র সঙ্গে চতুষ্কোণ একটি মিল ব্যবহার করতেন। তাছাড়া গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলায় যে সোনালি রং-এর ব্যবহার চোখে পড়ে প্রকৃতপক্ষে তা রং নয়। জাপানি স্ক্রিন পেন্টিং-এর অনুসরণে তিনি সোনালি রং-এর কাগজে ছবি আঁকা শুরু করেন। গগনেন্দ্রনাথের জন্য জাপান থেকে তিনি রং আর সোনালি বোর্ড আনানো হত। সোনালি বোর্ডে কম সময়ে ছবি আঁকা হয়ে যেতো বলে ওই কাগজ গগনেন্দ্রনাথ খুব পছন্দ করতেন।

গগনেন্দ্রনাথের প্রতিভার অনন্য অবদান দৃশ্যচিত্র। দৃশ্যচিত্র রচনায় তাঁর নৈপুণ্য অতুলনীয়। এই চিত্রকলায় তিনি যেমন নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বিচিত্র নিদর্শন রেখে গিয়েছেন তেমনি শহরের রূপের সঙ্গে বাংলার অতিপরিচিত গ্রামীণ জীবনের হৃদয়গ্রাহী ছবিও তুলে ধরেছেন অনায়াসলব্ধ ক্রিয়া কৌশলে।

'রহস্যলোক' চিত্রমালায় নিগূঢ় রহস্যাবৃত এক জগতের চিত্রায়ণ করেছেন তিনি অসামান্য মুনশিয়ানায়। এই চিত্রকল্পে গগনেন্দ্রনাথের ভূমিকা মিস্টিক শিল্পীর। জাপানি ও চিনা শিল্পীদের সাদাকালো রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি এমন একটি নিজস্ব শৈলীর উদ্ভাবন করেছেন, যা তাঁর আগে অন্য কোনো চিত্রকলায় দেখা যায় নি। চাইনিজ কালির সাহায্যে সিলুয়েট বা ছায়াছবি, বিশেষতঃ কালো মুখচ্ছবি রচনাতেও তাঁর প্রবণতা ছিল। এ প্রসঙ্গে টুপি মাথায় তাঁর নিজের সুপরিচিত ছায়াছবিটির কথা মনে আসে। স্ব-উদ্ভাবিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণের রহস্যলোক চিত্রমালার সঙ্গে তাঁর নিজের এই নিখুঁত মুখাকৃতির

প্রভূত সামঞ্জস্য আছে। গগনেন্দ্র নাথের আগে অন্য কোনো ভারতীয় শিল্পীকে সিলুয়েট রীতির প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা যায় না।

রূপদক্ষ গগনেন্দ্রনাথের তুলিতে ধরা আছে নানা মানুষের প্রতিকৃতি। পিতৃব্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখাকৃতি তাঁকে বারংবার আকর্ষণ করেছে। প্রতিকৃতিগুলি প্রধানত আঁকা হয়েছিল কালি-তুলির সাহায্যে। কোনো-কোনোটিতে আবার রঙের ছোঁওয়াও আছে। গগনেন্দ্রনাথ তাঁর 'রবিকা'-র একাধিক মুখচ্ছবি অঙ্কন করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ৩০শে এপ্রিলে কালি-তুলির সাহায্যে স্বল্প অথচ সীমিত রেখায় আঁকা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের যে ছবি ছবি তাতে সমগ্র মুখমণ্ডলের আকৃতিগত নিখুঁত রূপারোপই শুধু নয়, তাঁর জ্যোতির্ময় রূপলাবণ্যও অসীম নৈপুণ্যে গগনেন্দ্রনাথ যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে তাঁর আঁকা রবীন্দ্রনাথের মুখচ্ছবিগুলির মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে। কণিষ্ঠ ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথের প্রোফাইল বা পার্শ্বচিত্রটি যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি এই প্রসঙ্গে সহধর্মিণী প্রমোদকুমারী দেবীর ছোট একটি প্রোফাইলের কথাও মনে পড়ে যায়। নিপুন অঙ্কন চাতুর্যে এই অসাধারণ নিদর্শনটিতে অতি সূক্ষ্ম এবং সতর্ক তুলির টানে প্রমোদকুমারী দেবীর আয়ত চোখ আর মুখের আদলে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর স্নেহময়ী রূপটি। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা মুখচ্ছবির সংখ্যা খুব বেশি না হলেও এ বিষয়ে তাঁর সাফল্য ছিল প্রশ্নাতীত।

অন্বেষণ ও অনুশীলনই ছিল গগনেন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ। তাই পরবর্তী পর্বে এ বিষয়েও তিনি ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধ। আজকের সংবাদপত্রে কার্টুন সহজলভ্য, কিন্তু উনিশ শতকে ভারতীয় উদ্যোগে পরিচালিত সংবাদপত্রে কার্টুনের অস্তিত্ব ছিল অচিন্ত্যনীয়। গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রকলার আলোচনা প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। রামানন্দ নিয়মিত গগনেন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক চিত্র *প্রবাসী* ও *মডার্ণ রিভিউ*-তে প্রকাশ করেছেন। রামানন্দই ছিলেন গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

ব্যঙ্গচিত্রে সাধারণত কালো রঙের মাধ্যমেই শিল্পী তাঁর অঙ্কনচাতুর্য ও ভাবের প্রকাশ ঘটান। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ যে ব্যঙ্গচিত্রকেও রঙে রসে সিক্ত করে তুলতেন তার নেপথ্যে ছিল তাঁর সৌন্দর্য সৃষ্টির শিল্পী মন। ব্যঙ্গচিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে খ্যাতি কিম্বা জীবিকা অর্জনের কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না, সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্তির জন্যই তিনি আঁকতেন। বাংলা পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্র খুব বেশি চোখে পড়ে না। অনুমিত হয় বিশ্বকবির প্রথম বিমান বিহার উপলক্ষ্যে গগনেন্দ্রনাথই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে কার্টুনে আঁকেন। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে

ব্যঙ্গচিত্রকলার প্রদর্শনীর আয়োজনের উদ্যোগই যখন অকল্পনীয় ছিল সেই সময়ও গগনেন্দ্রনাথের কার্টুনের প্রদর্শনী হয়েছে একাধিকবার। কেবলমাত্র প্রদর্শনীর আয়োজনই নয়, গগনেন্দ্রনাথ *ব্যঙ্গচিত্র সংকলন* প্রকাশেরও পথিকৃৎ।

গগনেন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা একান্তভাবে শিল্পচর্চার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শিল্প-সাহিত্য ও অভিনয় কলার মাধ্যমে স্বদেশের সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ও মান উন্নয়নই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বাংলার শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণা করে জাতীয় ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে সার্বজনীন করে তুলতে তাঁর তৎপরতার অন্ত ছিল না। গগনেন্দ্রনাথ নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভায় নতুন নতুন সৃষ্টিতে আমরণ নিবিষ্ট ছিলেন অথচ মনটি ছিল শিশু ভোলানাথের মত সরল। আমরা অনেকেই বিস্মৃত হয়েছি যে এই বছর তিনি জন্মসার্ধশতবর্ষে উপনীত হয়েছেন। এই উপলক্ষে গগনেন্দ্রনাথের কাজ নিয়ে অধিক চর্চার প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র : রূপদক্ষ গগনেন্দ্রনাথ – কমল সরকার।

চিত্র পরিচিতি : ১। বাবা দেবেন্দ্রনাথের পাশে বালক কবি, বাগানের সামনের বারান্দায়; ২। নিসর্গ;
৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে প্রকাশিত।